Vol. 26 | No. 2 | 1983

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

লালন শাহ : জীবনদর্শন

Volume	26
Issue	2
Year	1983
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	লতিফা বেগম
Published online	April 1, 1983
DOI	10.62328/sp.v26i2.7
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v26i2.7
Pages	112-126
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

লালন শাহ : জীবনদর্শন

লতিফা বেগম

লালন শাহের জীবনদর্শনের আলোচনা সাধারণতঃ লালন-মানসে বিরাজমান প্রেক্ষাপটের আলোচনাকেই বুঝায়। অর্থাৎ তাঁর দীর্ঘজীবনকালে (১৭৭২-১৮৯০) তিনি যে-সব সংস্কৃতির অথবা ভাবধারার সংস্পর্শে এসেছেন এবং যেগুলোর প্রভাব তাঁর চিন্তাধারার উপর পতিত হয়েছে, সেগুলো সম্বন্ধেও কিছুটা আলোচনা করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। কারণ এ-বিশ্বের প্রায় সকল মনীষীর চিন্তাধারা নানাবিধ ভাবধারায় গঠিত, একেবারে নিরঙ্কুশ চিন্তাধারা এ-জগতে সত্যিই বিরল। তাই এ-প্রসঙ্গে আমরা ভারতীয় ইতিহাসে মুসলিমদের আগমনের পূর্বে এবং পরে যে-সব ভাবধারা বিকশিত হয়েছিল এবং যে-সব প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল, সে-সম্বন্ধে আলোকপাত করা প্রয়োজনীয় মনে করি। কারণ লালনের চিন্তাধারায় বিভিন্ন মতবাদের প্রভাব বর্তমান। লালনের জীবনদর্শনের আলোচনা প্রসঙ্গে তাই সেই জীবনদর্শনের প্রেক্ষাপটে অবস্থিত ভাবধারার আলোচনা প্রয়োজন।

সাধারণতঃ ধারণা করা হয় ইসলাম ধর্ম এ-দেশে বিজয়ী সুলতানদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই প্রবেশ করেছে। কিন্তু ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়, অষ্টম শতাব্দীর প্রথম দশকে মুহম্মদ বিন কাশিম কর্তৃক সিন্ধু প্রদেশ জয়ের পূর্বেও ভারতের পশ্চিম উপকূলে শিয়া মিশনারীগণ ইসলাম ধর্ম প্রচার করেছেন। অপর দিকে অন্য একটা ধারণা হচ্ছে এই, ইসলাম ধর্মের অন্তর্গত শরীয়তের আইন-কানুন পূর্ণাঙ্গভাবে এ-দেশে এসে উপস্থিত হয়েছে। অথচ ইতিহাসের আলোচনা করলে দেখা যায়, ইমাম আবু হানিফা এবং অন্যান্য ইমাম কর্তৃক শরীয়তের আইন-কানুন সুসমবদ্ধভাবে প্রকাশ করার পূর্বে এদেশে ইসলাম ধর্ম প্রবেশ করেছে। খ্রীস্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে বাগদাদের খলিফা মনসুরের শাসনকালে (৭৫৪-৭৭৫) ইমাম আবু হানিফা কর্তৃক শরীয়তের বিধানগুলো গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়ার পরে হানাফী মাজহাবের সৃষ্টি হয়। তার ফলে শরীয়তের বিধানগুলো পাকা-পোক্তভাবে পৃথিবীর সর্বত্র প্রকাশিত হয় তেমনি অন্যান্য মাজহাবের ইমামগণের দ্বারাও যেসব মাজহাবের সৃষ্টি হয়েছে, যেগুলো এ-বিশ্বের সর্বত্র প্রকাশিত হতে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়। ভারতের বুকে বিভিন্নদলে যেসব মুসলিম মিশনারী ও সওদাগর ইসলাম ধর্ম প্রচার করেছিলেন, তাদের সঙ্গে ইসলামী শরীয়তের পাকাপোক্ত বিধানগুলো পূর্ণাঙ্গভাবে ছিল না। খোলাফায়ে রাশেদীনের বর্ণিত শরীয়তের বিধানগুলো তাঁরা যথাযথভাবে পালন করার চেষ্টা করেছেন বটে, তবে কোন লিখিত গ্রন্থাদি সঙ্গে না থাকায় তারা শরীয়তের কোন কোন বিশিষ্ট দিকের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

শরীয়তের মূল বক্তব্য হল, এ পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা একমাত্র আল্লাহ্, যিনি সর্বশক্তিমান এবং হযরত মুহম্মদ (দঃ) তাঁর প্রেরিত রসুল। আল্লাহ্র বাণী এবং রসুলের নির্দেশের উপর আস্থা স্থাপন করে জীবন-যাপন করা প্রত্যেক মুসলিমের অবশ্যিক কর্তব্য। মৃত্যুর পর রোজ-কেয়ামতে মানুষের বিচার হবে, পাপীকে দোজখে এবং পুণ্যবান ব্যক্তিকে স্থান দেওয়া হবে বেহেস্তে।

অপরদিকে মা'রিফতপন্থীদের মধ্যে অনেকে শিয়াদেরও আগে এদেশে ইসলাম ধর্ম প্রচার করেছেন বটে, তবে তাঁদের মধ্যে তখনও বিভিন্ন তরীকার সুষ্ঠুরূপ পুস্তক আকারে প্রকাশিত হয়নি বলে, তাঁরাও তাঁদের পূর্ববর্তীদের জীবন-কাহিনী থেকে আহরিত নানা তত্ত্ব জনসমাজে প্রচার করেছেন। শরীয়ত ও মা'রিফতের মধ্যে কোন তারতম্যমূলক আলোচনাও সে-যুগে সম্ভবপর হয়নি। মা'রিফতপন্থীরা তাঁদের স্বকীয় মতবাদ জনসাধারণের মধ্যে অবলীলাক্রমে প্রচার করেছেন এবং প্রত্যেকেই নিজের মতবাদকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে প্রাধান্য দান করেছেন।

মা'রিফতের তত্ত্ব সাধারণতঃ সুফিদের মধ্যেই বিশেষভাবে বিকাশ লাভ করেছে। সুফিদের মূল লক্ষ্য হল আল্লাহ্‌র সঙ্গে মানবাত্মার মিলন। তবে কেউ-বা প্রেমের মাধ্যমে, কেউ-বা ভক্তির মাধ্যমে, আবার কেউ-বা জ্ঞানের মাধ্যমে কতকগুলো নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করে, অভীষ্টলাভে সফল হয়েছেন। এ-জগৎ, তাঁদের কাছে মায়াময়, অনিত্য এবং সকল প্রকার বন্ধনের মূল কারণ। কাজেই এ-সংসারের প্রতি সকল প্রকার লোভ-লালসা ত্যাগ করে, কৃচ্ছ্র সাধনার মাধ্যমে "ক্বলবে"র বিকাশ সাধন করতে হবে এবং তার ফলেই সত্যের সঙ্গে ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ হয়ে মানুষ আনন্দময় জীবন-যাপন করতে পারে। তবে কোন সুফিই নিজেকে আল্লাহ্‌র সত্তার (Essense) সঙ্গে ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ বলে দাবী করেননি এবং কোন সুফিই অবতারবাদ ও জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না। অদ্বৈত বেদান্তবাদীদের মত তাঁদেরকে সর্বেশ্বরবাদীও বলা যায় না। কারণ তাঁরা মানবাত্মাকে পরমাত্মার সত্তার সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে একীভূত সত্তাবলে ধারণা করেননি। সুফিরা পরকালে বেহেস্তলাভের জন্য আকাঙ্ক্ষিত ছিলেন না। তাদের কামনা ছিল, এ-জীবনেই আল্লাহ্‌র সঙ্গে মিলিত হওয়া এবং মানবাত্মা ও আল্লাহ্‌র মধ্যে যে-ভেদ রয়েছে, তা বিলোপ করা। এ-জন্য—তাঁদের কার্যকলাপে শরীয়তের কঠোর বিধানগুলো অনেক সময়ই পালিত হয়নি। তবে শরীয়তকে তারা অস্বীকার করেননি। বরং শরীয়তের সাধারণ অর্থের অন্তরালে যে গূঢ়তত্ত্ব রয়েছে, সে অন্তর্নিহিত তত্ত্বের সন্ধানে প্রবৃত্ত রয়েছেন।

মুসলিমেরা এ-দেশে আগমন করার পর হিন্দুধর্মের যে-সব শাখার সঙ্গে পরিচিতি হয়েছেন, সেগুলোকে যথাক্রমে বৈদান্তিক, শৈব, বৈষ্ণব ও শাক্ত বলা যায়। তবে ইসলাম ধর্মের সংস্পর্শের ফলে হিন্দুদের মধ্যে ভাগবতধর্মের বিকাশ হয়। বৈষ্ণবদের মধ্যেই এ-ভাগবতধর্ম বিশেষভাবে বিকাশলাভ করে। এ-বৈষ্ণবধর্মের মধ্যে একাধিক সম্প্রদায় থাকলেও বিষ্ণু, নারায়ণ ও শ্রীকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে এ ধর্ম বিবর্তিত হয়েছে। বাংলাদেশের বৈশিষ্ট্য এই যে, এখানে বৈষ্ণবধর্মের প্রধান দেবতা হিসেবে শ্রীকৃষ্ণকে গ্রহণ করা হয়েছে। তবে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে মহাভারতে বর্ণিত যে চিত্র পাওয়া যায়, বাংলাদেশের সাধারণ হিন্দুসমাজে প্রচলিত শ্রীকৃষ্ণের ধারণার সঙ্গে তার কোন সাদৃশ্য নেই। মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, তিনি দ্বারকার রাজা, দ্রৌপদীর সখা, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্জুনের রথের সারথি। এজন্য তাঁর অপরনাম পার্থসারথি। বাংলাদেশে শ্রীকৃষ্ণকে যে-রূপে ধারণা করা হয়, সেখানে তাকে পাওয়া যায় গোকুলের গোপদের সখা, শ্রীরাধিকার বল্লভ, মুকুন্দ মুরারী বংশীধারী গোপীজন মনলোভা অপূর্ব আকর্ষণকারী এক পুরুষরূপে।

এ-উপমহাদেশে ভাগবতধর্মের বিকাশ ছাড়াও, হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের মধ্যে সমন্বয়ের জন্য আরো নানা ধরনের প্রচেষ্টা দেখা দিয়েছে। এর মধ্যে রামানন্দ, কবির, নানক ও চৈতন্যদেবের সাধনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রামানন্দ ইসলামের একেশ্বরবাদের উপর গুরুত্ব আরোপ করে হিন্দুধর্মের সংস্কার করতে চেয়েছিলেন। চৈতন্যদেব ইসলামের

একেশ্বরবাদ ও শ্রেণীহীন সমাজব্যবস্থার আদর্শে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করেছিলেন। অপরদিকে নানক একেশ্বরবাদ ও শ্রেণীহীন সমাজব্যবস্থা ও ইসলামের জেহাদী মনোবৃত্তির দ্বারা প্রণোদিত হয়ে শিখধর্মের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তবে কবিরের সাধনা ছিল সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী। তিনি হিন্দুধর্মের সংহিতা ও ইসলামধর্মের শরীয়তকে বর্জন করে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কে একই সত্তার প্রত্যয়ে বিশ্বাসী এবং একই আচরণের অনুসারী করে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তাঁর এ মতবাদকে বাউলপন্থী মতবাদ বলা যায়।

বাউলপন্থীদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল মনের মানুষের সন্ধান এবং তাঁর সঙ্গে ঐক্য সাধন। বাউলেরা শরীয়তকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করেছেন। তাদের মধ্যে যদিও বিভিন্ন মতভেদ রয়েছে, তবুও তাঁদের সাধারণ ধারণা হল মন্দিরে অথবা মসজিদে আল্লাহ্ অথবা ব্রহ্মকে পাওয়া যায় না। তাঁকে পেতে হলে জীবাত্মার অন্তরে সেই আন্তর-মানুষের সাধনায় লিপ্ত হতে হবে। হিন্দু অথবা মুসলমান যেই-ই হউক না কেন, সে স্বীয় মতামত পরিত্যাগ করে সাধনায় লিপ্ত হলে সেই আন্তর-মানুষের সাক্ষাৎ লাভ করতে পারে। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের নরসিংদিতে রামদাস বাউল নামে একজন বিখ্যাত বাউলের আবির্ভাব হয়েছিল। তিনি আজীবন এ সাধনাই করে গেছেন। বাউলসম্প্রদায়ের অপর এক শাখা রয়েছে সিলেটে। মোঘল সম্রাট আকবরের সমসাময়িক জগমোহন গোঁসাই বলে এক ব্যক্তি হিন্দুধর্মের আচার-অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করে, সেই বাউলধর্মই প্রচার করেছেন। পূর্বোক্ত কবিরের অনুসারীদের বলা হয় কবিরপন্থী, রামদাসের অনুসারীদের বলা হয় রামদাসী এবং জগমোহনের অনুসারীদের বলা হয় জগমোহনী। তবে লালনের জন্মের পূর্বেই এ স্বতন্ত্র-শ্রেণীর বাউলেরা আবার হিন্দুধর্মেরই এক শাখায় পরিণত হয়েছে। কিন্তু মুসলিমদের মধ্যে এ-জাতীয় ভাবধারার লোকেরা কোন শ্রেণীতে পরিণত হয়নি। তারা সমাজ বহির্ভূত ছন্নছাড়া জীবন-যাপন করেছে। এজন্য মুসলিম সমাজে বাউলদের কোন বিশেষ স্থান নেই।

লালনের জন্মের সময়, বাংলা তথা ভারতবাসী মুসলিমদের এক চরম দুর্দশার সময়। এ পতন-যুগের সূচনায় মুসলিমদের মধ্যে ঐক্য বজায় রাখার জন্য চলেছে ওহাবী মতবাদের দ্বারা প্রভাবান্বিত আলীম সম্প্রদায়ের প্রচারণা। অপরদিকে ইসলামের সঙ্গে সংযোগের ফলে হিন্দুসমাজ থেকে উত্থিত আউল, বাউল, সাঁই, দরবেশ প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়ের অভিনব মতবাদের প্রকাশ। আবার সুফরিাও তাদের সুফিতত্ত্ব বাংলার জনসাধারণের মধ্যে প্রচারে ছিলেন রত। সুফিদের মতবাদের অপব্যাখ্যার ফলে এবং সুফিধর্মের সঙ্গে বাংলাদেশের আউল, বাউল, সাঁই, দরবেশ প্রভৃতি মতবাদের সাদৃশ্য রয়েছে বলে সুফিধর্ম সম্বন্ধে নানাবিধ ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়।

এ-রূপ পরিস্থিতিতে জন্মগ্রহণ করে লালন বিভিন্ন যুগে বিরাজমান মতবাদের মূলতত্ত্বকে আত্মস্থ করে তাঁর নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করেন। তাঁর মতবাদ আলোচনা করলে দেখা যায় তাতে ইসলামের শরীয়ত, মা'রিফত, সুফিমতবাদ প্রভৃতির অবদান যেমন রয়েছে, তেমনি বৈষ্ণবধর্ম, শৈবধর্ম প্রভৃতির ছাপও বর্তমান এবং সর্বোপরি বাউলধর্মেরও প্রভাব বিশেষভাবে স্পষ্ট। মানস-বিকাশের ক্রম-ধারায় লালন কিভাবে তাঁর নিজস্ব মতবাদে উন্নীত হয়েছেন এ-প্রবন্ধে তা-ই আলোচিত হয়েছে।

মানস-বিকাশের সূচনাতে লালন প্রথমে শরীয়তের বিধানসমূহের উপর আস্থা স্থাপন করে এবং শরীয়ত প্রদত্ত ধারণা অনুযায়ী আল্লাহ্কে উদ্দেশ্য করে, কাতরভাবে প্রার্থনা করেছেন ;

ইলাহি আলমীনগো আল্লাহ্ বাদশা আলমপানা তুমি।
ভাসায়ে ডুবাতে পার, ডুবায়ে কিনার দাও কারো,
রাখ হাত তোমার, তাইতে তোমায় ডাকি আমি ।।[১]

অথবা,

ডাকরে মন আমার হক্ নাম আল্লা বলে।
ভেবে বুঝে দেখ সকলি বে-হক্
হক্ মোর আল্লার নামটি তাও ভুলিলে ।।[২]

কেবল আল্লাহ্কেই নয়, রসুলকে উদ্দেশ্য করেও লালন লিখেছেন :

আয়গো যাই নবীর দীনে।
দীনের ডংকা বাজে সদাই মক্কা-মদীনে ।।
তরীক দিচ্ছেন নবী জাহের-বাতুনে,
যথাযোগ্য লায়েক জেনে,
(ওসে) রোযা আর নামায্
ব্যক্ত এহি কাজ
গুপ্ত পথ মেলে ভক্তির সন্ধানে ।।[৩]

উক্ত কবিতায় স্পষ্টই বুঝা যায় লালন বাউলদের মত শরীয়তের বিধানকে অস্বীকার করেননি। তবে তিনি শরীয়তের বাহ্যিক রূপেই সন্তুষ্ট থাকেননি, তার অন্তর্নিহিত তত্ত্ব জানার জন্য সব সময়ই ব্যাকুল ছিলেন। এজন্য সেই শরীয়তের নীতির অন্তরালে তরীকার যে নদী প্রবহমান, সেই নদীর 'নৌকাখানি'তে আরোহণ করার জন্য মানব সাধারণকে আহ্বান করেছেন :

তরীকারো নৌকাখানি
ইশক নাম তার বলায় শুনি,
বিনে বাওয়ায় চলছে অমনি
রাত্রি-দিনে ।।[৪]

এছাড়াও আমরা দেখিতে পাই শরীয়ত প্রদত্ত নবীর (দঃ) বিবরণের অন্তরালে যে নূর-ই-মুহম্মদী নামক দার্শনিকতত্ত্ব রয়েছে, তা উল্লেখ করে লালন লিখেছেন :

নবীর অঙ্গে জগত পয়দা হয়
সেই যে আকার কি হল তার
কে করে নির্ণয় ।।[৫]

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, সুফিদের কোন এক শাখার মতবাদ অনুসারে আল্লাহ্র রসুলের রয়েছে দুই সত্তা। একরূপে তিনি মানুষরূপী মুহম্মদ আবদুল্লাহ্ আমেনার সন্তান, অপররূপে তিনি আল্লাহ্র সত্তার মধ্যে অবস্থিত নূর-ই-মোহাম্মদীরূপে বিরাজমান। এ-জগৎ প্রকাশিত হওয়ার মূলে রয়েছে যে নূর-ই-মোহাম্মদী এবং সে নূর-ই-মোহাম্মদী থেকেই এ-জগতের উৎপত্তি। লালন এ-ক্ষেত্রে সে নূর-ই-মোহাম্মদীর উল্লেখ করেছেন। তবে পরবর্তীকালে তিনি শরীয়ত প্রদর্শিত তত্ত্ব থেকে কিছুটা সরে পড়েছেন। সুফিদের

নিয়ম অনুসারে সত্য লাভ করতে হলে একজন গুরুর কাছে মুরীদ হতে হয়, যাকে বলা হয় মুরশিদ। এ মুরশিদতত্ত্বে এসে লালন মুরশিদকেই এ-বিশ্বের সর্ব শ্রেষ্ঠ মানুষ বলে স্বীকার করেছেন এবং সে-বিশ্বাসের স্বীকারোক্তি :

আপনি খোদা, আপনি নবী
আপনি যে আদম সফী
অনন্তরূপ করে ধরন
কে বোঝে তার নিরাকরণ
নিরাকার হাকিম নিরঞ্জন
মুরশিদরূপ ভজন-পথে ।।[৬]

এ-ক্ষেত্রে তিনি খোদা, নবী ও মুরশিদকে একাকার করে মুরশিদকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছেন। যদিও সুফি তরীকায় মুরশিদকে পথ প্রদর্শকরূপে গ্রহণ করা হয়, তবু কোন সুফি মুরশিদকে আল্লাহ্ বা রসুলের (দঃ) সঙ্গে একাকার করেননি। সুফিদের মতবাদ অনুসারে সাধনার প্রথম স্তরে সাধকের পক্ষে মুরশিদের সঙ্গে একাকার হওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়, যাকে বলা হয় ফানাফিস্ শেয়খ্। এ-স্তরের পরে আসে ফানা-ফির-রসুল, অর্থাৎ রসুলের অস্তিত্বের মধ্যে সাধকের অস্তিত্বকে বিলীন করতে হবে। তার পরবর্তী পর্যায়ে রয়েছে ফানাফিল্লাহ্ অর্থাৎ এ-স্তরে আল্লাহর অস্তিত্বের মধ্যে নিজেকে বিলীন করা। এ-স্তরের চরম পরিণতি হচ্ছে বাকাবিল্লাহ্ স্তরে, অর্থাৎ আল্লাহ্র অস্তিত্বে চিরন্তনভাবে বিরাজ করা। এ-ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে লালন মুরশিদের অস্তিত্বের মধ্যেই সকল স্তরের সন্ধান পেয়েছেন। কাজেই এখানেও তিনি সুফিদের মতবাদ থেকে খানিকটা সরে পড়েছেন।

কেবল মুরশিদের সঙ্গে আল্লাহ্ ও রসুলকে একাকার করেই লালন ক্ষান্ত হননি। মুরশিদের রহস্যময় তত্ত্বকে আরো পরিষ্কার করার জন্য বলেছেন :

মুরশিদ ধনি গুণমণি গোপনে র'লো।
তারে চিনা না গেল ।।
চার যুগে সে রয় গোপনে
দেখা নাই তার সনে,
ব্রহ্মা বিষ্ণু না পায় ধ্যানে।
মনে মনে পথ হারিয়ে চেয়ে র'লো।

নূর নবী কে মেহের করে
আপনি দিদার হলো ।।[৭]

এখানে দেখা যায় আবার তিনি মুরশিদের সঙ্গে হযরত রসুলের (দঃ) সুফিসত্তাকে একাকার করে নিয়েছেন। এতে স্পষ্টই বুঝা যায়, তাঁর সাধনার ধারা ঠিক সুফিদের পথে অগ্রসর হয়নি। একথা তাঁর মুরশিদ সম্বন্ধীয় অন্যান্য উক্তিতেও প্রকাশ পেয়েছে :

শরীয়ত তরীকত আর যে
হকীকত মারফত লিখেছে
এ ছাড়া চার পথ আছে
জানে দরবীশ ফকীরে ।।[৮]

এ-ক্ষেত্রে লালন বলতে চেয়েছেন যে, শরীয়ত, তরীকত, হকীকত ও মা'রিফত ছাড়াও আরও চারটা পথ আছে। লালন সে পথ আবিষ্কার করেছেন, তার নিজের দেহের মধ্যেই এবং গুরুকেই সেই দেহযন্ত্র সংশোধন করার জন্য আহ্বান করেছেন :

যন্তরেতে যন্ত্রী যেমন,
যেরূপ বাজাও বাজে তেমন,
তেমনি যন্ত্র আমারি মন
বোল তোমার হাতে।[৯]

উক্ত কবিতায় লালন বলতে চেয়েছেন মুরশিদ বা গুরুর হাতেই রয়েছে সাধকের আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতির চাবিকাঠি। গুরু ইচ্ছা করলেই সাধকের দেহের মধ্যে অবস্থিত পরম-সত্তার লীলা-খেলা অবলীলাক্রমে ফুটিয়ে তুলতে পারেন। এ-জন্য তিনি বলেছেন :

গুরুর দয়া যারে হয় যেই জানে।
যে রূপ সাঁই-এর লীলা খেলা এ দেহ-ভুবনে।।
জলে ডিম্বু আলের উপর
অখণ্ড প্রলয়ের মাঝার,
বিন্দুতে হয় সিন্ধুর আকার
ধারা ত্রিগুণে ।।[১০]

এ-পর্যায় থেকেই শুরু হল লালনদর্শনের সূচনা। সাধকের দেহের মধ্যেই পরমসত্তা বিরাজ করেন এবং গুরুর নির্দেশে সেই পরমসত্তাকে সাধনার দ্বারা উপলব্ধি করা যায়। পূর্ববর্তী পর্যায়ে আমরা দেখেছি তিনি মুরশিদ সম্বন্ধে যে-ধারণা পোষণ করতেন, তার মধ্যে ছিল মানবাত্মা, পরমাত্মা ও রসুলের ধারণা। এ-পর্যায়ে রসুলের মাধ্যমে সেই পরম-আত্মার সঙ্গে একীভূত হওয়ার জন্য তাঁর জীবনের ব্যাকুলতা দেখা দিয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে দেহের মধ্যেই সেই পরমসত্তাকে আবিষ্কার করার জন্য তিনি ব্যাকুল হয়ে পড়েছেন। এ-পর্যায় থেকেই শুরু হয়েছে তার আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয় নানাবিধ ভাষণ। সাধনার ধারার প্রথম পর্যায়ে শরীয়তের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে, তিনি যে পদক্ষেপ নিয়েছিলেন, সুফিতত্ত্বের পর্যায়ে এসে রসুলকে সেভাবে নুর-ই মোহাম্মদী বা বিশ্বসত্তার প্রকাশের এক ধারা বলে ধারণা করেছিলেন। আমরা দেখেছি সে পূর্ববর্তী পর্যায় থেকে উন্নীত হয়ে তিনি তাঁর দেহের মধ্যেই সে পরম সত্তার অস্তিত্ব রয়েছে বলে ধারণা করেছেন এবং আদিসত্তার তত্ত্ব থেকে আত্মতত্ত্বে তিনি অধিকতর মনোসংযোগ করেছেন। তিনি নিজেকে সম্বোধন করে বলেছেন :

ক্ষেপা তুই না জেনে তোর আপন খবর
যাবি কোথায় ।
আপন ঘর না বুঝে বাহিরে খুঁজে
পড়বি বাঁধায় ।।

আপনি সত্য না হলে
গুরু সত্য হয় কোন কালে,
আপনি যেরূপ দেখ না সেরূপ
দীন দয়াময় ।।

আল্লারূপে যেই অধর
সঙ্গী অঙ্গ ষোল কলা তার
ভেদ না জেনে বনে বনে
খুঁজলে কি হয় ।।

আপনার আপনি না চিনে
ঘুরবি কত ভুবনে
লালন বলে, অন্তিম কালে
নাই রে উপায় ।।[১১]

এতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে আদিসত্তা সম্বন্ধে লালনের মনে স্পষ্ট প্রত্যয়ের সৃষ্টি হয়েছে : তিনি বাইরে কোথাও বিরাজমান নন। তিনি রয়েছেন মানুষের অন্তস্তলে বিরাজমান। তাকে পেতে হলে আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করতে হবে। এজন্য বার বার সে সম্বন্ধে আপনাকে এবং মানবকুলের প্রতি সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছেন। তিনি বিশ্বজনকে সম্বোধন করে বলেছেন :

এই বেলা তোর মনের মানুষ চিনে সাধন কর।
মানুষ পালাইবে দেহ-ছেড়ে পড়ে রবে শুধু ঘর ।।
ঘরের মধ্যে তের তিন তের কোন দরজা করছে যার,
ঘরের মধ্যে বাস্তুখুঁটী সেইটা করগা মূলাধার ।।

অর্থাৎ যে-পরম সত্তা মানুষের দেহেই বিরাজ করছে। তাঁকে পাওয়ার জন্য মানুষের পক্ষে অন্য কোথাও অন্বেষণ করার প্রয়োজন নেই। এজন্য তিনি দৃঢ় ভাষায় বলেছেন :

এই মানুষে আছে, রে মন,
যারে বলে মানুষ-রতন
লালন বলে, পেয়ে যে ধন
পারলাম না চিনিতে ।।[১৩]

এখানে তাঁর প্রত্যয় অত্যন্ত স্পষ্ট। এ-ক্ষেত্রে তিনি সুফিতত্ত্ব থেকে আরো অনেক দূরে চলে গেছেন। সুফিদের মধ্যে একটা প্রচলিত বচন রয়েছে : "যে তার আত্মাকে জেনেছে, সে তার রব্বকেও জেনেছে।" এতে আপাতদৃষ্টিতে বুঝা যায় মানবাত্মা ও পরমাত্মা একই সত্তার দুটো প্রকাশ। তবে সুফিরা পরমাত্মাকে সম্পূর্ণভাবে দেহের মধ্যেই বিরাজমান বলে ধারণা করেননি। দেহ-বহির্ভূত ও তাঁর সত্তা রয়েছে এবং তিনি সর্বত্র বিরাজমান বলে তাদের ধারণা। লালন অবশ্য কোন-কোন স্থলে এ-সম্বন্ধে সুফিদের মত ধারণা পোষণ করেছেন :

খাঁচার ভিতর অচিন পাখী
কম্‌নে আসে যায় ।
ধরতে পারলে মন-বেড়ী
দিতাম তার পায় ।।[১৪]

তবে আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনাকালে তিনি আত্মা এবং পরমাত্মাকে সম্পূর্ণভাবে একই সত্তা বলে ধারণা করেছেন :

সিরাজ সাঁই বলেরে লালন,
গুরুপদে ডুবে আপন
আত্মার ভেদ জানলে না।
আত্মা আর পরম-আত্মা,
ভিন্ন ভেদ জেনো না ।।[১৫]

তাঁর এ-উক্তিতে স্পষ্টই বুঝা যায়, লালন জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে কোন ভেদই স্বীকার করতে রাজী নন, অর্থাৎ দেহস্থিত আত্মা এবং পরমাত্মার মধ্যে কোন ভেদ নেই। দেহতত্ত্বের স্তরে পৌঁছে লালন এ-ধারণাকেই আরো স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন :

আছে আদি মক্কা এই মানব দেহে
দেখ না রে মন ভেয়ে।
দেশ দেশান্তর দৌড়ে এবার
মরিস কেন হাঁপিয়ে ।।

করে অতি আজব ভাক্কা
গঠেছে সাঁই মানুষ-মক্কা
কুদরতি নূর দিয়ে।
তার চার দ্বারে চার নূরী এমাম
মধ্যে সাঁই বসিয়ে ।।[১৬]

এ-ক্ষেত্রে লালন মক্কা, মদিনা নামক পবিত্র স্থানগুলোকে, মানুষের অন্তরে বিরাজমান ভিন্ন সূক্ষ্ম স্থান বলে গ্রহণ করেছেন এবং সেই মনের মক্কায় হাজার হাজার মানুষ হজ্জ করে পুণ্যলাভ করছে বলে তিনি নিশ্চিত হয়েছেন। কেবল মক্কা, মদিনা নয়, এ মানুষের দেহেই রয়েছে আঠার (১৮) মোকাম। সেই আঠার মোকামে সদাসর্বদাই রূপের বাতি জ্বলছে। মানুষের পক্ষে সেই বাতি সম্বন্ধে অবহিত হওয়াই সত্যিকার কাজ। এজন্য তিনি বলেছেন :

আঠারো মোকামে একটি রূপের বাতি
জ্বলছে সদায় ।।
নাই তেল তার নাই তুলা আজগুবি
হয়েছে উদয় ।।
মোকামের মধ্যে মোকাম
শূন্য শিখর বলি যার নাম,
বাতির লণ্ঠন সেথায় মোদাম
ত্রি-ভুবনে কিরণ ধায় ।।[১৭]

এখানে লালন বলতে চেয়েছেন যে, মানুষের দেহের মধ্যেই রয়েছে নানা স্থান এবং সেগুলির বিকাশ সাধনে মানুষ সত্যের সঙ্গে পরিচয়লাভে ধন্য হয়। যদিও সুফিতত্ত্বের মধ্যে সে-সব বিভিন্ন সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়কে বিকশিত করার জন্য সাধন-পদ্ধতি আছে, তবু লালন সেদিকে না গিয়ে যোগসাধনার-পদ্ধতিকে তাঁর সাধনপথের আলোক হিসেবে গ্রহণ করেছেন এজন্য ইঙ্গলা-পিঙ্গলা নাড়ীকে জাগ্রত করার জন্য লালন তাঁর নিজের মনকে আহ্বান করেছেন। জীবননদীর কূলে বসে আছেন তিনি, সাঁতার জানেন না। তাই রূপকের ছলে বলেছেন, যদি ভালোভাবে সাঁতার অভ্যস্ত হওয়া যায়,

তবে মানুষ অমরত্বলাভ করতে পারে এবং নাড়ীরূপী ইঙ্গলা-পিঙ্গলাকে বশীভূত করে আত্মার সেই আসল স্থিতিতে উত্তরণ করা যায়। যেমন তিনি বলছেন :

বিরহার কূলে না জানি সাঁতার।
আমার গহীন গম্ভীরের জল
তিনটি ধারা বয়,
সেই নদীতে স্নান করিলে
জন্ম-মৃত্যু না হয় আর ॥

ইঙ্গলা—পিঙ্গলা নারী
কুসময় না দেয় তালা
শ্রীগুরু কাণ্ডারী বিনে
না যায় তালা খোলা
চাবির কারিগর আছে,
রঘুনাথ কামার
দরজাতে আছে খাড়া
রূপ-সনাতন চৌকিদার,
লালন বলে, কাতর হালে
থাকা চাই হুঁশিয়ার ॥[১৮]

লালন এখানে বলতে চেয়েছেন গুরুর প্রদর্শিত পথে এ-দেহরূপ মহাপ্রাসাদে রূপসনাতনরূপী যেসব পাহারাদার রয়েছে তাদের দেখতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গুলো সে আসল কামরায় যেতে যে-প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছে, ইঙ্গলা এবং পিঙ্গলা নামী নাড়ীদ্বয়ের জাগরণের ফলে সে কামরার তালা খোলা যায়। তার ফলে মানুষ সেই মানুষ-রতনরূপ মহারাজের প্রাসাদে সুরক্ষিত কক্ষে উপস্থিত হতে পারে।

তবে আশ্চর্যের বিষয় এই, পরম সত্তাকে দেহের মধ্যে বিরাজমান বলে দৃঢ় বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও, লালন মানবাত্মা ও পরমাত্মাকে সম্পূর্ণ একাকার করতে চাননি। এখানেই সুফিদের প্রত্যয়ের সঙ্গে তাঁর কিছুটা সাদৃশ্য রয়েছে। যেমন :

চিনি হওয়া মজা, কি খাওয়া মজা।
দেখ দেখি মন কোনটা মজা ॥
সালোক্য সামীপ্য সাষ্টি
স্বরূপ্য মুক্তি আদি,
বলছে যা, এসব মুক্তি
পায়তারা হয়ে রয় যমের প্রজা ॥
নির্বাণ মুক্তি সেধে সেত
লয় হয় পণ্ডর মত মুক্তি হওয়া
চিনিতে চিনি খায় তাতে কি জানা যায়
দুঃখ সুখ বোঝা ॥[১৯]

লালন বলতে চেয়েছেন সাধকের পক্ষে সাধনার বস্তুর সঙ্গে একাকার হওয়ার মধ্যে কোন আনন্দ নেই। উভয়ের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য থাকা চাই। এ-ধারণারই প্রকাশ নিচের উদ্ধৃতিতে :

চাঁদ-চকোরে রঙ্ মহল ঘরে
থেকে থেকে ঝলক দিচেছ্ সদাই।
দেখ্লে সেই চাঁদ, সফল হয় নয়ন চাঁদ
আত্ম-তত্ত্ব ঢুঁড়ে দেখ না হৃদয় ।।[২০]

দেখা যাচেছ্ সাধক এবং সাধনার আরাধ্য বিষয়ের মধ্যে নানা তিথিতে ঐক্য দেখা দিলেও তাদের মধ্যে বৈশিষ্ট্য ও ব্যবধান থেকে যায়। এতে স্পষ্টই বুঝা যায়, তিনি জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে সূক্ষ্ম হলেও একটা ভেদরেখা টানতে চান।

আমরা পূর্বেই দেখতে পেয়েছি ইসলাম ধর্মের অন্তর্গত শরীয়ত এবং মা'রিফতের স্তর থেকে লালন ক্রমেই সরে পড়েছেন। তাঁর এ-বিচ্ছিন্নতার ভাব কেবল মুরশিদতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব অথবা দেহতত্ত্বেই প্রকাশ পায়নি। অন্যান্য ধর্মের সার গ্রহণ করা কালেও তিনি সে একই ভাবধারা প্রকাশ করেছেন।

বৈষ্ণবধর্মের তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনাকালে সর্ব প্রথমে তিনি শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কিত নানাবিধ তত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণকে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের লোকেরা বিষ্ণুর পূর্ণ অবতার বলেই গণ্য করেন। যদিও বৃন্দাবনের গোয়ালা সমাজে তিনি তাঁর নানাবিধ লীলা প্রদর্শন করেছেন, প্রেমিক হিসেবে তিনি জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার কঠোর প্রেম-লীলার নিদর্শন দেখিয়েছেন, তথাপি দার্শনিকদের মতে শ্রীকৃষ্ণ কোন ব্যক্তিসত্তা নন। তিনি হচেছ্ন স্বয়ং পরম ঈশ্বর এবং তাঁর বাঁশীর সুরের আকর্ষণে জীবাত্মারূপী শ্রীরাধিকাকে আকর্ষণ করেছেন। এজন্য তাঁর এ লীলাখেলাকে রূপকের মাধমেই ব্যাখ্যা করতে হবে। লালন শ্রীকৃষ্ণের অস্তিত্ব প্রসঙ্গে যে উক্তি করেছেন, তাতে শ্রীকৃষ্ণকে রূপকের আকারে গ্রহণ না করে ব্রহ্মের এক অংশরূপে গ্রহণ করেছেন। এজন্য তিনি বলেছেন :

অনাদির আদি শ্রীকৃষ্ণ-নিধি,
তার কি আছে কভু গোষ্ঠলীলা।
ব্রহ্মরূপে সে অটলে বসে,
লীলাকারী হয় তার অংশ কলা ।।[২১]

এতে স্পষ্টই বোঝা যায় তিনি শ্রীকৃষ্ণকে পরম ব্রহ্মের অংশ রূপেই ধারণা করেছেন। তাঁর কাছে শ্রীকৃষ্ণ মানুষ-রূপে দেখা দিলেও তিনি অবতার। সাধারণতঃ পূর্ণাবতার বলে বৈষ্ণবসমাজে পূজিত হলেও লালন তাকে ব্রহ্মের অংশ-কলা বলে ধারণা করেছেন। তাই অপর এক জায়গায় বলেছেন :

বেদ-বিধির অগোচর সদাই,
কৃষ্ণপদ্ম নিত্য উদয়
লালন বলে, মনে দ্বিধায়
দেখে দেখ না ।।[২২]

এখানেও লালন বলতে চেয়েছেন শ্রীকৃষ্ণরূপ পদ্মের নিত্য উদয় হচেছ্। এ প্রকাশ বেদ-বিধিতেও গোচরীভূত নয়। এতে স্পষ্টই বোঝা যায় তিনি শ্রীকৃষ্ণকে প্রচলিত অর্থে ব্যবহৃত অবতাররূপেও গ্রহণ করেননি। তাঁর মতবাদ অনুসারে পরম ব্রহ্মেরই এক অংশরূপে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অনন্ত লীলা প্রদর্শন করেছেন। সে-লীলার মাধুর্য বুঝতে হলে সাধনার

প্রয়োজন। কারণ তিনি বেদ-বিধিতে বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণ নন। তিনি হচ্ছেন আদি ব্রহ্মেরই এক মহান অংশ।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম প্রবর্তক চৈতন্য দেব সম্বন্ধে বর্ণনা প্রসঙ্গে লালন বলেছেন :

গোলকেরি চাঁদ গোকুলের চাঁদ
নদীয়ায় গৌরাঙ্গ সেই পূর্ণ চাঁদ,
আর কি আছে চাঁদ সে আর কেমন চাঁদ
আমার ঐ ভাবনা মনে মনে ।।[২৩]

লালন এখানে বলতে চেয়েছেন গোলকের বিষ্ণুরূপে যিনি বিরাজমান ছিলেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণরূপে গোকুলের চাঁদ হয়ে দেখা দিয়েছে এবং সে একই চাঁদ গৌরাঙ্গরূপে দেখা দিয়েছে। এতে স্পষ্টই বুঝা যায় তিনি অবতারবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তবে তিনি অবতারগণকে সেই পরম ব্রহ্মের অংশ বলে মনে করতেন।

লালন-দর্শনের পরিক্রমার অন্তে আমরা বুঝতে পারছি, লালন বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য ব্রতী ছিলেন। তিনি ইসলাম ও হিন্দুধর্মের মধ্যে এক গভীর ঐক্যসূত্রের আবিষ্কার করেছেন। পয়গম্বরতত্ত্ব ও অবতারতত্ত্বের মধ্যে তিনি ঐক্য দেখতে পেয়েছেন। আল্লাহ্‌র ইচ্ছা অনুসারে, এ জগতে তাঁরই বিভিন্ন গুণের অংশরূপে পয়গম্বরগণ আবির্ভূত হয়ে মানুষকে আল্লাহ্‌র পথে নিয়ে যাওয়ার জন্য আজীবন সাধনা করেছেন। তেমনি শ্রীকৃষ্ণ বা গৌরাঙ্গ প্রমুখ অবতারগণ পরম ব্রহ্মার অংশরূপে আবির্ভূত হয়ে মানুষকে সেই ব্রহ্মজ্ঞান দান করার জন্য সাধনা করেছেন। সাধনার পক্ষে হিন্দুদের গুরু ও মুসলিমদের মুরশিদ একমাত্র পথ-প্রদর্শক বলে এ উভয়ের মধ্যেও তিনি এক ঐক্যের ভাব আবিষ্কার করেছেন। তবে শরীয়তের বিপরীত ধারায় তিনি এ গুরুকে আল্লাহ্‌রই একরূপ বলে গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয়েছেন। কিন্তু আল্লাহ্ অথবা পরম ব্রহ্মকে তিনি মানবদেহের বাইরে অবস্থিত কোন সত্তা বলে গ্রহণ করেননি। তাঁর কাছে সে পরম ব্রহ্ম বা আল্লাহ্ মানবদেহেই বিরাজিত এক অপূর্ব সত্তা। পীর-মুরশিদের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে সেই পরম সত্তার কাছে জীবাত্মাকে পৌঁছে দেয়া। এখানেই রয়েছে লালন-দর্শনের বিশেষত্ব। লালন ইসলাম অথবা হিন্দুধর্মকে দুটো পরস্পর-বিরোধী ধর্ম বলে গ্রহণ করেননি। তাঁর কাছে উভয় ধর্মই সাধনার ক্ষেত্রে দুটো পথ মাত্র। যে-কোন পথে রওনা দিলেই সত্যিকার গুরুর নির্দেশ লাভে ধন্য হলে সাধকের পক্ষে তাঁর গন্তব্যস্থলে পৌঁছার সম্ভাবনা রয়েছে। কাজেই লালন শাহকে হিন্দু, মুসলমান বা সুফি, দরবেশ কোন কিছু বলেই বর্ণনা করা যায় না। তিনি ছিলেন নিজস্ব মতবাদে প্রত্যয়ী এক দার্শনিক কবি, যাঁর কাছে মনের মানুষের সন্ধানই ছিল মানব-জীবনের একমাত্র লক্ষ্য।

এ-প্রসঙ্গে বাংলাদেশের অপর তিনজন মরমী কবি মদন, সেক ভানু ও হাসন রাজার জীবন-দর্শনের আলোচনা করলে লালনের ভাবধারা আরো পরিষ্কার হবে বলে আমাদের ধারণা। কারণ এ তিনজন মরমীকবি শরীয়তের ধারায় অগ্রসর না হয়ে তত্ত্বজ্ঞানের মাধ্যমে সত্য-সন্ধানের চেষ্টা করেছেন। মদন প্রসঙ্গে বলা যায়, তিনি বাউল সম্প্রদায়ভুক্ত লোক ছিলেন। গুরুর কৃপার উপর তিনি ছিলেন সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। এজন্য গুরুকে সম্বোধন করে তিনি বলেছেন :

নিঠুর গরজী, তুই কি মানস—মুকুল ভাজবি আগুনে ?
তুই ফুল ফুটাবি, বাস ছুটাবি সবুর বিহনে ?

দেখ না আমার পরমগুরু সাঁই,
যে যুগযুগান্তে ফুটায় মুকুল, তাড়া-হুড়া নাই।
তোর লোভ প্রচণ্ড,
তাই ভরসা দণ্ড,
এর কাছে কোন উপায় ?[২৪]

এ-ক্ষেত্রে দেখা যায়, লালনের মানস-সত্য-লাভের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হওয়ার পূর্বেও, তাঁর গুরু তাঁকে অকাল-পক্ক সাধকরূপে তৈরী করতে চেয়েছেন।

তাঁর সেই সাধনার চরম লক্ষ্য হচ্ছে মানস মুকুলের বিকাশলাভ। বাউল সম্প্রদায়ভুক্ত বলে তিনি আত্মার বহির্ভূত কোন শক্তির কার্যকারিতায় বিশ্বাসী নন। তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় রয়েছে একমাত্র গুরুর কৃপায় আত্মা বিকাশলাভ করতে পারে। অর্থাৎ মদন তাঁর দেহের বহির্ভূত অন্য কোন সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করছেন না, বরং দেহের মধ্যে বিরাজমান মানস-মুকুলের বিকাশের জন্য তাঁর গুরুর উপর নির্ভর করেছেন। অপরদিকে লালন শাহের চিন্তাধারার মধ্যে মানুষের দেহের মধ্যেই আল্লাহ বিরাজ করছেন এবং সাধনার দ্বারা মানুষ তাকে উপলব্ধি করতে পারে—এরূপ কোন ভাব নেই। এজন্য অবশ্য গুরুর প্রয়োজন। তবে সেই গুরুরা যুগে যুগে দেখা দিচ্ছেন পীর, পয়গম্বর এবং অবতাররূপে এবং তাঁরা সকলেই আল্লাহ্‌র এক এক অংশ ব্যতীত আর কিছু নন। তবে লালনও মদনের মত সেই সত্যের সন্ধান পেয়েছেন মানব-দেহের মধ্যেই।

অপরদিকে মা'রিফতী তত্ত্বে বিশ্বাসী, সেক ভানু মুরশিদকে গুরু বলে গ্রহণ করেছেন এবং এ গুরুর দ্বারাই মানবাত্মার চরম বিকাশ সাধিত হতে পারে বলে বর্ণনা করেছেন। নিভৃত-নির্জনে মানবাত্মার সঙ্গে যে আল্লাহ্‌র মিলন হতে পারে এ-তত্ত্বটি অনবদ্য ভাষায় তিনি প্রকাশ করেছেন :

নিশাতে যাইও ফুল বনেরে ভ্রমরা নিশাতে যাইও ফুল বনে ।।
নয় দরজা করি বন্ধ, লইয়ে ফুলের গন্ধ, অন্তরে জপিও বন্দের নামরে ।।
জ্বালাইও দেলের বাতি, ফুল ফুটিয়ে নানা জাতি, কত রঙ্গে ধরবে ফুলের কলিরে।
ডাল পাতা বৃক্ষ নাই, এমন ফুল ফুটাইছে সাঁই, ভাবিক ছাড়া বুঝবে না পণ্ডিতেরে ।।
অধীন সেক ভানু বলে, ঢেউ খেলিও আপনা দেলে,
পদ্ম যেমন ভাসে গঙ্গার জলেরে ।।
ভ্রমরা নিশাতে যাইও ফুল বনে ।।[২৫]

সেক ভানুর বক্তব্য থেকে বুঝা যায় নিভৃত-নির্জনে নির্বিকার সাধনার দ্বারা জীবাত্মা তার প্রকৃত স্বরূপ বিকশিত করতে পারে এবং সেই বিকাশের মূলে রয়েছে সেই পরম সাঁই বা মুরশিদ, যিনি সাধনার ফলে তাঁকে চরম ও পরমভাবে বিকশিত করে তোলেন। তিনি একদিকে আল্লাহ্‌কে দর্শকরূপে এবং অপরদিকে গুরুকে এ পথের প্রদর্শক হিসেবে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু লালন শাহের বক্তব্যে আমরা দেখি তিনি আল্লাহ্‌কে দেহের সংগে সংশ্লিষ্ট এক পরম সত্তা বলে উপলব্ধি করেছেন।

অপর মরমী-কবি হাসন রাজা সাধনার পরিণতিতে এমন এক স্তরে এসে পৌঁছে-ছিলেন, যেখানে তিনি উপলব্ধি করেছেন যে তাঁর সত্তা থেকেই এ বিশ্বের সব কিছুর উৎপত্তি। এজন্য তিনি বলেছেন : "আমি হতে সব উৎপত্তি"। তবে এ হাসন রাজা কোন ব্যক্তি হাসন রাজা নন। এ হাসন রাজা হচ্ছেন মানবজীবনের প্রতিনিধি হাসন

রাজা, যাঁর মাধ্যমে সেই অনন্ত শক্তিশালী আল্লাহ্ এ বিশ্বের সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। কাজেই দেখা যাচ্ছে হাসন রাজাও লালনের মত পরম সত্তাকে তাঁর দেহের মধ্যে বিরাজিত সত্য বলে গ্রহণ করেননি। তিনি বলেছেন তাঁর সত্তা থেকেই এ বিশ্বের সব কিছুর উৎপত্তি। তবে তাঁর এ সত্তা সেই পরম সত্তারই এক মানবিক সংস্করণ। কাজেই সে-সত্তাকে উপলব্ধি করতে হলে, এ বিশ্বে পরিব্যাপ্ত এক মহান সত্যরূপে সে-সত্তা কিভাবে মানব সত্তায় পরিণত হয়ে আবার এ বিশ্বের অনন্তরূপে প্রকাশিত হয়, এ সত্যকে উপলব্ধি করতে হবে। কাজেই লালনের মত তিনিও পরম সত্যকে কেবল এক মানব দেহের মধ্যেই আবদ্ধ রাখেননি। কেননা তিনি মনে করেন এ বিশ্বসত্তা ব্যক্তি-সত্তার মধ্যে পরিব্যাপ্ত নন। ব্যক্তি-সত্তার তুরীয়তার ক্ষেত্রে (Transcendence) তার অস্তিত্ব রয়েছে। লালন শাহও মনে করেন যে আদি-সত্তা মানব দেহের মধ্যে কেবল পরিব্যাপ্ত নয়, মানব দেহের তুরীয় ক্ষেত্রেও তার অস্তিত্ব রয়েছে। তবে তাদের মধ্যে পার্থক্য হল লালনের ধারণা আদি-সত্তা সর্বতোভাবে মানবজীবন নিরপেক্ষ। মানব দেহে তার স্থান রয়েছে। অপরপক্ষে, হাসন রাজার ধারণা মানব-সত্তা থেকেই সে আদি-সত্তার উৎপত্তি এবং তা থেকেই সে-আদি সত্তা বিশ্বভূমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত। যে-ব্যক্তিসত্তা থেকে সে-আদি সত্তার উৎপত্তি, সে কিন্তু ব্যক্তি হাসন রাজা নন, সে হচ্ছে মানবজীবনের প্রতিনিধি আদি-মানব, যার আপাতঃদৃষ্ট রূপ হচ্ছে হাসন রাজা।

উল্লেখ্য যে, লালনের মতবাদের সঙ্গে পাশ্চাত্তের মরমীবাদীদের মতবাদের আলোচনা করলে, তাঁদের সঙ্গেও লালনের মতবাদের পার্থক্য স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। গ্রীক দর্শনের পতন যুগে আলেকজান্দ্রিয়ায় নব্য প্লাটোবাদের যে আস্তানার সৃষ্টি হয়, সেখানে দর্শনকে মানবজীবনের আরো ঘনিষ্ট সংস্পর্শে আনয়ন করার জন্য সাধনা দেখা দেয়। গ্রীকদ-র্শনে প্লেটো এবং এ্যারিস্টটল যে ভাবধারার সৃষ্টি করেছিলেন, সেখানে মানবজীবনের মধ্যে যুক্তিকেই সর্বপ্রধান স্থান দান করা হয়। আবার আলেকজান্দ্রিয়ায় যে দার্শনিক-তত্ত্ব প্লটিনাসের নেতৃত্বে গড়ে উঠে, সেখানে শুধু মাত্র বুদ্ধি নয়, অনুশীলনের দ্বারা পরিশোধিত আত্মার পক্ষে কিভাবে পরমাত্মার সংগে মিলিত হওয়া সম্ভবপর, সে সম্বন্ধেও আলোচনা করা হয়েছে। সর্বশেষ পর্যায়ে মানবাত্মা-সমাধি (Trance), উল্লাস (Rapture) ও মহানন্দের মাধ্যমে ব্রহ্মলাভে সমর্থ হয়ে কিভাবে বিরাজ করে, তারও বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

আধুনিক দর্শনে স্পিনোজার মতবাদ অনুসারে দেখা যায় যে, ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান ও বুদ্ধি-লব্ধ জ্ঞানের উপরের স্তরে স্বজ্ঞা বলে জ্ঞানের পৃথক একটা মাধ্যম রয়েছে। যুক্তির দ্বারা যে পর্যায়ে দীর্ঘসূত্র অবলম্বন করে আরোহণ করা যায়, স্বজ্ঞার মাধ্যমে কিন্তু পলকের মধ্যেই সেই স্তরে আরোহণ করা যায়। তবে কিভাবে মানুষের জীবনে সেই স্তরে আরোহণ করা যায়, স্পিনোজা যে-পথ প্রদর্শন করেননি।

অতি আধুনিক কালে প্লটিনাসের ভক্ত ডীন ইন্জ (Dean Inge) প্লটিনাসের মতবাদের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, মানবাত্মা দ্বান্দ্বিক ন্যায়-শাস্ত্রের মাধ্যমে সত্যের দ্বারে এসে উপস্থিত হয় এবং তাকে উপলব্ধি করার একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে স্বজ্ঞা। ডীন ইন্জের দর্শনে মানবাত্মার মুক্তিপন্থা নির্দেশিত হয়েছে সত্য, তবে মানব দেহের সঙ্গে সমাধি, উল্লাস বা মহানন্দের কি সম্পর্ক তা নির্ধারিত হয়নি।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে হেনরী বার্গসোঁ স্বজ্ঞাকে জ্ঞানের সর্বোচ্চ স্তর বলে প্রদর্শন করেছেন। তাঁর মতবাদ অনুসারে স্বজ্ঞার স্তরের জ্ঞানলাভ করা মানুষের পক্ষে আয়াস-সাধ্য। মানুষ সাধনার দ্বারা সেই জ্ঞানলাভে সমর্থ হয়।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, প্লটিনাস, স্পিনোজা, বার্গসোঁ বা ডীন ইন্‌জ, সকলেই লালনের মত স্বজ্ঞা নামক অপর এক জ্ঞানের মাধ্যমকে স্বীকার করেছেন। তবে প্লটিনাস ব্যতীত অন্য কেউই জ্ঞানের সেই মাধ্যমকে বিকাশ করার কোন পদ্ধতি প্রদর্শন করেননি। কিন্তু লালন যেমন সেই কার্যকারিতা স্বীকার করেছেন, তেমনি সেই জ্ঞানকে কিভাবে আয়ত্ত করা যায়, তারও ইঙ্গিত দিয়েছেন। এজন্য প্রাচ্য দেশীয় মরমীবাদীদের মতবাদের সঙ্গে তাঁর মতবাদের যে ঐক্য রয়েছে, প্রতিচ্যের স্বজ্ঞাবাদীদের মতবাদের সঙ্গে সে ঐক্য নেই। পাশ্চাত্যের স্বজ্ঞাবাদীদের বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, তাঁরা স্বজ্ঞাকে বাইরের থেকে দর্শকের দৃষ্টিতে দেখেছেন। কিন্তু অনুভূতির মাধ্যমে স্বজ্ঞার রস আস্বাদন করে তাঁদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেননি। পূর্বোক্ত প্লটিনাস, স্পিনোজা, ডীন ইন্‌জ ও বার্গসোঁর মতবাদ পর্যালোচনা প্রসঙ্গে দেখা যায় যে, বার্গসোঁর মতবাদই প্রাচ্য-দেশীয় মরমীবাদীদের মতবাদের অধিক নিকটবর্তী বলে মনে হয়। ভারতীয় দর্শনে প্রায় সকল ক্ষেত্রেই অনুশীলনের জন্য প্রেরণা দেয়া হয়েছে। যদিও অনুশীলনের পদ্ধতিতে তারতম্য রয়েছে, তবুও প্রায় সকল মতবাদের মধ্যেই অনুশীলনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে তাই লালনের মতবাদের সঙ্গে ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায়ের ও সুফিদের মতবাদের ঐক্য রয়েছে। কাজেই লালনকে সর্বতোভাবেই প্রাচ্য-দেশীয় মরমীবাদী বলা যায়। তিনি জীবনের কোন এক পর্যায়ে সুফিদের চিস্তিয়া তরীকায় দীক্ষা গ্রহণ করলেও পূর্বাপর তিনি সেই তরীকার নীতি পালন করেননি এবং সেই তরীকার মধ্যেই তাঁর মানসকে সীমাবদ্ধ রাখেননি। মতবাদ প্রকাশের বেলা তিনি সম্পূর্ণ স্বকীয়তা প্রকাশ করেছেন। এজন্য নানা মতবাদের ছায়াপাত ঘটেছে তাঁর মতবাদে। লালন দর্শনকে তাই কোন এক বিশেষ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। নিজস্ব স্বরূপে এ-দর্শন এক অভিনব রূপ লাভ করে বিশিষ্টতা অর্জন করেছে।

তথ্যনির্দেশ

১ মুহম্মদ আবু তালিব : 'লালনশাহ্ ও লালন-গীতিকা', প্রথম খণ্ড, (বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৫) পৃ, ২৪৭
২ ঐ, পৃ. ২৫৯
৩ ঐ, পৃ. ২৬৪
৪ ঐ, পৃ. ২৭১
৫ ঐ, পৃ. ২৭৯
৬ ঐ, পৃ. ২৮৯
৭ ঐ, পৃ. ৩০১
৮ ঐ, পৃ. ৩০৪
৯ ঐ, পৃ. ৩০৬
১০ ঐ, পৃ. ৩০৭
১১ ঐ, পৃ. ৩২৩
১২ ঐ, পৃ. ৩২৫
১৩ ঐ, পৃ. ৩৩১
১৪ ঐ, পৃ. ৩৮৭
১৫ ঐ, পৃ. ৩৪১

১৬ ঐ, পৃ. ৩৯০
১৭ ঐ, পৃ. ৩৯৭
১৮ ঐ, পৃ. ৪২০
১৯ ঐ, পৃ. ৪৩০
২০ ঐ, পৃ. ৪৫০
২১ ঐ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৮৫
২২ ঐ, পৃ. ১২৬
২৩ ঐ, পৃ. ১৫৯
২৪ অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য : 'বাংলার বাউল ও বাউল গান', ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী, কলিকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৭৮, পৃ. ১০৪১
২৫ মুনশী আব্দুল লতিফ সাহেব-সম্পাদিত 'ছহি সেক ভানুর পুথী', হামিদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৫৮, পৃ. ৪৬

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য : বাংলার বাউল ও বাউল গান, ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানী, কলিকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৭৮
২ শ্রীসনৎকুমার মিত্র : লালন ফকির, কবি ও কাব্য, পুস্তকবিপনি, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৩৮৬
৩ খন্দকার রিয়াজুল হক-সম্পাদিত 'লালন সাহিত্য ও দর্শন', মুক্তধারা, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, আগস্ট ১৯৭৬
৪ বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর-সম্পাদিত 'বাউল গান ও দুদ্দু শাহ্', বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম সংস্করণ, কার্তিক ১৩৭১
৫ শ্রীহীরেন বন্দ্যোপাধ্যায় : বাউল বৈষ্ণব কথা, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ, বৈশাখ ১৩৮৫
৬ অন্নদাশঙ্কর রায় : লালন ও তাঁর গান, শৈব্যা, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৩৮৫ : দ্বিতীয় মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারী ১৩৮৭
৭ মুহম্মদ কামালউদ্দীন : লালন গীতিকা, মুক্তধারা, ঢাকা, তৃতীয় সংস্করণ, ফেব্রুয়ারী ১৯৭৭
৮ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ : মরমী কবি হাসন রেজা, মঞ্জিল প্রকাশনী, ঢাকা, ১৩৮৬
৯ মোহাম্মদ আজরফ : ইসলামী আন্দোলন যুগে যুগে, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, বৈশাখ ১৩৮৭
১০ SONGS OF LALON SHAH, Translated by Abu Rushd, Bengali Academy, Dhaka, Ist. edition, April 1964
১১ F. Thilly : A HISTORY OF PHILOSOPHY : Central Book Dept., Allahabad, 1973